দৈনিক বাংলা

তারিখ 18 JUL 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

049

স্বপ্নভঙ্গের কাছে পরাভূত আবেগ

...ক্ষার ফল বের ...যে জিনিসটির ...য়, তা হচ্ছে রস- ...রীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে ...লো গোলকটির সম্পর্ক ...নিবিড়। এমনিতেই জীবনের যে কোনও শুভক্ষণে এই গোলগাল ছানার পদার্থটি অমোঘ হয়ে ওঠে —যদিও আর সব দিনে এর নাম না মনে করলেও চলে। সকল মানুষের জীবনে শুভবার্তা এক সঙ্গে ডংকা বাজায় না বলে রস-গোল্লার চাহিদা ও সরবরাহের হেরফের ঘটে না। কিন্তু পরীক্ষায় পাসের সময়ে চাহিদাটা এক কালীন বেশি হয় বলেই গোল বাঁধে—বিশেষ করে এসএসসি পরীক্ষার মতোন সবচেয়ে বেশি ব্যাপক ও পরীক্ষার্থীর জীবনের প্রথম চমক সৃষ্টিকারী পরীক্ষার ক্ষেত্রে।

এ কারণেই যেদিন বোর্ডের পরীক্ষার ফল বের হয়, সেদিন বিকেলের দিকেই মিষ্টির দোকান গুলো খালি হয়ে যায়।

এ দিয়েই দেশ বা সমাজের ঐতিহ্য নির্ণীত হয়। কোনো সুখবর পেলেই আমরা বলে ফেলি 'মিষ্টি চাই'। এই চাওয়ার মধ্যে ব্যঞ্জনা যতোটা—শব্দগত তাৎপর্য ততোটা নয়। কেননা এ চাওয়ায় লোলুপতা নেই, লজ্জা নেই, দ্বিধা নেই। আছে সুবিমল আনন্দ। এ আনন্দ একদিকে গ্রহণের অন্যদিকে প্রদানের। শুভ বার্তা প্রদানকারী যখন 'মিষ্টি খাওয়ানোর' দাবি শোনে, তখন যথার্থই সম্মানিত বোধ করে—কেননা এমন দাবির মধ্যে আন্তরিকতা মাখানো শুভকামনা থাকে সুন্দর ইচ্ছা বা খুশি হওয়ার বহিঃপ্রকাশই উচ্ছ্বাস ভরা কণ্ঠে মিষ্টি চাওয়া। খাওয়াতেই হবে, এমন কোনও বাধকতা নেই, খাও যালেও তার মান পরিমাণের নির্ধারণ নেই। এ শুধু সাফল্যের জন্য প্রীতি জানানো, এ কেবল উৎফুল্ল মুহূর্তের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি ছড়ানো।

এটাই রীতি, এটাই রেওয়াজ। যদিও এর পরিবর্তন ঘটছে আজ। আজকের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত অভিমার্জিত মন মিষ্টি চায় না, মিষ্টি করে 'অভিনন্দন' জানায়। 'অভিনন্দন' শব্দটির উচ্চারণই এখন যথেষ্ট—যদি মর্যাদা বা আত্মীয়তা থাকে, তবে দেয়া যায় উপহার টুকি-টাকি অথবা বর্ণালি বা শুভ্র পুষ্পের গুচ্ছ। আরও একধাপ এগুতে চাইলে ডাকা যায় 'চাই-নিজে'। পরিশীলন ও পরিমার্জনার নামে এখন সবই পরিমিত।

পরিমাপ প্রশ্ন নয় প্রশ্ন হচ্ছে পদ্ধতি। দড়ি—কাগজ বাঁধা মাটির হাঁড়ির রসগোল্লা আজ অকল্পনীয়—ছিল আবেগ উচ্ছল তায় ছলছল-কণ্ঠ, গেলো এখন তাও। নগর জীবনে অকৃত্রিম আবেগের অকৃত্রিম প্রকাশের নাম 'গেঁয়োপনা' তুড়ি যারা মারতে চান তাদের কপালে 'ক্ষেত' ছাড়া আর কোনও উপাধি জোটে না।

এখনকার অনবদ্য আবিষ্কার কাগজের কার্ড। শিল্পায়িত সেই কার্ডের 'অভিনন্দন' শব্দটি এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ। জন্মদিন, বিয়ে বার্ষিকী, ঈদ, নতুন বছর পরীক্ষায় পাস—যেকোনও বিষয়েই এই কাগুজে গ্রিটিংস সামাজিকতা রক্ষা করে। রক্ষা নয় কেবল কালচারেরও প্রমাণ দেয়। দোকানের তৈরি গরমও রসালো মিষ্টির স্থানে আসন করে নিয়েছে যে শক্ত কাগজের শুকানো কালির অভিনন্দন—তা এখন সর্ব অর্থে সেরা বলে বিবেচিত হয়।

এগিয়ে চলেছে সভ্যতা। এখন কার্ড পাঠিয়েই খালাস মানুষ, এ কার্ড ডাকপিওন বয়ে দিয়ে যায়। ফুলও যদি পাঠাতে চান, দোকানে ফোন করে ঠিকানা দিলে দোকানীই তা করে দেয়—কেবল তার প্রাপ্য ফি টা পেলেই হয়।

টেলিফোন করাও এখন সম্ভব হয় না—কারণ সময়। এ কারণেই কার্ড, এ কারণেই পয়সার বিনিময়ে বাহক। কড়ি খরচা করে নিয়ম বাঁচানো নিরুপায় মানুষ আজকের দিনে যেন বড় নিরুপায়।

অন্তরঙ্গতা এড়ানো সম্ভব না হলে যদি সাক্ষাৎ দিতেই হয়, তাহলেও যে ঘনাপিনা, তাতে 'মিষ্টি'-র ঠাঁই নেই। পরিবর্তে প্লেন বা ক্রীম কেক। 'কেক' দিয়েই কুল-মান ধরে রাখতে হয়। যদি কেক-এর গুঁড়ো গলা আটকে ফেলে, যদি মনের গহনে রসের গোল্লার ছবি উঁকি মারে তাও মুখ ফুটে বলার নয়, কেননা তাতে ঐ গ্রামীণ সংস্কৃতির আভাসই ধরা দেয়ার শংকা থেকে যায়। শহরের আলো-হাওয়ার দোলাচলে থেকে দূর গাঁয়ের ও হারানো দিনের কালচারকে 'ঐতিহ্য' বলে উদ্দীপ্ত হওয়ার সাহস কোনো প্রাণের হতে পারে বা হয়? হয় না। খোলা-মেলা ভাবসাব এখন আর যাই হোক, 'ভদ্রতা' না। মাপা কথা, চাপা ভাবই এখন সৌজন্য।

কিন্তু সমাজের বৃহত্তর গোষ্ঠী আজও এমন অগ্রগতির সঙ্গে তাল মেলাতে যে ব্যর্থ হচ্ছেন, তার প্রমাণ মেলে শুভ-খবরে এমন ভিড় করে মিষ্টি কেনার হুজুগ থেকে। মিষ্টি মানে রসগোল্লা, চমচম, সন্দেশ, এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলে গুড়-বাতাসাও হতে পারে। মেয়ে-জামাই, ছেলে-বউ, নাতি-নাতনীর আগমন থেকে আরম্ভ করে পাস করা, জলপানি পাওয়া, বিদেশ যাওয়া পর্যন্ত যে কোনও আনন্দের ব্যাপারে এদেশের সহজ সাধারণ মানুষ আজও উদ্বেল হতে জানেন এবং পারেন তার অংশীদার করতে অন্যকেও।

আনন্দিত হওয়া এবং আনন্দের এমন প্রকাশ ক্রমশই অপাংক্তেয় হতে চলেছে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের এ যুগে আনন্দ গভীর হয়ে যেন বাজতে জানে না বুকে, জানে না তা স্পর্শ করাতে অপরকে। শোভন ভদ্রতায় যেটুকু নইলে নয়, কেবল তা-ই সই, আর সব বাড়তি। বাড়তি মানে বাড়াবাড়ি। বাড়াবাড়িকে যান্ত্রিক যুগ ক্ষমাহীন চোখে দেখে।

কে জানে, কালে কালে হয়তো এই কটুর মেকিসর্বস্বরাই টিকে থাকবে। হয়তো একদিন আজ যেটুকু আছে, কাল তা-ও বাহুল্য হয়ে বিসর্জনে যাবে।

আজ যাঁরা সন্তানের সাফল্যে কষ্ট করে হলেও একটু-কিছু কিনে আনেন আর তা দশজনকে বিলোতে ভালোবাসেন, তাঁরা তা করছেন নিজেদের সুপ্ত স্মৃতি থেকে। মনে পড়ে যায়, সন্তানের পাসের খবরে লজ্জা মনে পড়ে যায়, একদিন আমও পাস করেছিলাম। তারপর সেদিনের বিজয়ের যে আনন্দ প্রকাশ ছিল, তা যেন ঘিরে ধরে মাকে। অনেকটা অজ্ঞাতেই মানুষ সেই চিরতরে চলে যাওয়া মানুষের অনুকরণ করে। করে তৃপ্তি লাভ করে।

কিন্তু এই অনুকরণের ইচ্ছাটুকুও উবে যাচ্ছে। আজকের সফল ছাত্রছাত্রী যুগের সার্থক প্রতিনিধি। তাদের মধ্যে অতীত নেই। শুধু বর্তমান এবং পরীক্ষার সাফল্যে জেগে ওঠে ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যতের সেই স্বপ্নের কাছে গদ্যময় মনে হয় আপ্লুত বাবা-মায়ের বিহ্বল সাম্প্রতীত আয়োজনকে। হয়তো নিষ্প্রয়োজনও মনে হয় সময় সময়। তাই অনেকে বিব্রত বোধ করে মিষ্টির অঢেল আমদানীতে, হয়তো তাকায়ও না সেদিকে, হয়ে আঁকে ভবিষ্যতের, কোন পথে গেলে জীবন জয়মাল্য দেবে, কোথায় সে পুষ্পরথ যা নির্বাধ আকাশে টেনে নেবে, বা মুক্তি দেবে বদ্ধভূমির শত সীমাবদ্ধ পরিবেশ থেকে। বাবা-মাকেই বুঝি অবুঝ কিশোর-কিশোরী মনে হয় সন্তানের চোখে, তারা নম্র দৃষ্টিতে অনেকটা প্রশ্রয়ের হাসি হাসে—দুরালাপনীর একটি কলকল কণ্ঠের অভিনন্দন অথবা কাগজের কার্ডের একটি গ্রিটিংস অনেক মূল্যবান মনে হয় তাদের কাছে।

এমনি করেই মানুষ এগিয়ে চলেছে, যেমন করে তারা অরণ্য কেটে নগর বানিয়েছে, মাটি-ছাড়া হয়ে আকাশছোঁয়া বাড়ি বানিয়েছে। কিন্তু ফের আজ বনানীর জন্য চিৎকার করছে, আহাজারি শুরু করেছে মাটির প্রাঙ্গণের জন্য।

সে কারণেই প্রশ্ন জাগে—যে আবেগকে শুষে ফেলতে চাইছে এমন করে আজকের যন্ত্র-মন, সে আবেগের জন্যই কি একদিন আর্তি ফুটবে না তার কণ্ঠে? হারিয়ে ফিরে পাওয়ার জন্য আর্তনাদ না করে যেন হারাতে না হয়, সে প্রয়াসই কি ভালো নয় তবে?

—হোসনে আরা লাভলু